BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02100035
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 10| November 2024| e-ISSN: 2584-1890

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’: চিহ্নময় প্রকরণের দিগন্ত বিস্তার

ড. মমতা চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেহরু কলেজ, পয়লাপুল, কাছাড়, আসাম

সংক্ষিপ্তসার: *জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী কবিব্যক্তিত্ব; তিনি একাধারে কবি, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক। যে চারজনকে হাংরি আন্দোলনের জনক বলা হয় তাঁদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি কবিতাকে বলতেন পদ্য। চল্লিশের অধিক কাব্যগ্রন্থের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথম উপন্যাস ‘কুয়োতলা’ দুটি-ই ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’। এই কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতাগুলি নিয়ে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হল।*

মূলশব্দ: *শক্তি চট্টোপাধ্যায়, হাংরি আন্দোলন, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই, কুয়োতলা, গা-ভর্তি ঘা, শ্রুত স্বর, অশ্রুত স্বর।*

মূল আলোচনা:

জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী কবিব্যক্তিত্ব; তিনি একাধারে কবি, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক। যে চারজনকে হাংরি আন্দোলনের জনক বলা হয় তাঁদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি কবিতাকে বলতেন পদ্য।

এই বহু পঠিত অথচ জনপ্রিয় কবির জন্ম ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৩, মৃত্যু ২৩শে মার্চ ১৯৯৫। ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’ (১৯৬১) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, এই বছরই অর্থাৎ ১৯৬১ সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘কুয়োতলা’।

চল্লিশের অধিক কাব্যগ্রন্থের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বহুপ্রজ লেখক তাই তাঁর কবিতা পাঠকের গভীর অভিনিবেশ দাবি করে।

১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’। এই কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতাগুলিতে লক্ষ করা গেছে সময় ও সমাজের দহন ও অনন্বয়; সেই সঙ্গে চিহ্নময় প্রকরণের দিগন্ত বিস্তার। আদিকল্পের বিনির্মাণে কবি করেছেন নূতন প্রবণতার সূত্রপাত; আর সেই নূতন প্রবণতা পাঠককে নিয়ে গেছে এক চেতনার উপকূল থেকে অন্য চেতনার উপকূলে।

‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘কিসের জন্যে’ শুরু হয়েছে—

গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে-বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কীসের জন্যে নিজে জানি না! মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে
কারণ, নাকি উড়োজাহাজ? কারণ, নাকি হলুদবাড়ি?

—এই নিবিড় উচ্চারণের মধ্যে যে আত্মনাট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে চিহ্নময় প্রকরণের বিস্তার সেখানেই। ঘুনে ধরা সময়ে যেখানে আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে অহরহ, প্রতিনিয়ত ঘটছে রক্তক্ষরণ, তখন 'গা-ভর্তি ঘা' নিয়ে 'বড়ো ধরনের যন্ত্রণা' ছাড়া আর কী-ই বা আশা করা যায়। বিচ্ছিন্ন জীবন স্বরূপের যন্ত্রণায় পীড়িত কবিমনের হৃদয় নিঙ্ড়ানো আর্তি ভাষা থেকে পরাভাষার জগতে পৌঁছে গেছে। কবি জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন সৌন্দর্যের মধ্যে, উপচে-পড়া প্রাচুর্য আর সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্যে—

"যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর? ফুটবলে ফাঁক, হাঁটুর ব্যথা?

যন্ত্রণা কি ভালো মানুষ সবার হাতেই তালি বাজাবে?"

যন্ত্রণারও যে এরকম অপূর্ব ছবি আঁকা যায় তা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা না পড়লে অজানা থেকে যেত। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় শব্দকে হাতের তালুতে নিয়ে খেলেছেন 'নিপুন জাদুকরের মতো' 'শব্দ শুধু শব্দ' কবিতাটিতে শব্দ প্রয়োগের কী আশ্চর্য মুন্সিয়ানা—

"যেন পাহাড় ভাঙতে আমার একটি জীবন নষ্ট হবে

প্রভু কি তাই ভাঙলে তুমি? ...

নাকি হিসেব সমস্ত ভুল, কালবিনাশী সহাস্যতায়

নদীতে বাঁধ বাঁধলে কমায়"

সৃষ্টিশীল মানুষের জীবন জুড়ে প্রতিনিয়ত চলে যে জৈবিক ও শৈল্পিক টানাপোড়েন আলোচ্য কবিতায় যেন তারই ইঙ্গিতময় প্রকাশ। 'শব্দ শুধু শব্দ' কবিতাটির প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে আছে শেষোক্ত পঙ্ক্তিতে—

"শব্দ শুধু শব্দ এবং শব্দ মানেই সাশ্রু কুমীর!"

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় শব্দকে জীবন ও যাপনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি রূপে উপলব্ধি করেন বলেই 'পেতে শুয়েছি শব্দ' কবিতায় কবির উচ্চারণ—

"শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি...

তা যদি হয় শব্দ তাকে করেছি মহাজব্দ"

এবং পেতে শুয়েছি শব্দ ... করো মরণে টানাটানি"

কবিতাটিতে বিবৃত শাব্দিক তথ্য যেখানে সমাপ্ত হচ্ছে আসলে সেখান থেকেই অর্থাৎ সেই সমাপ্তি বিন্দু থেকেই শুরু হচ্ছে কবিতাটি। আলোচ্য কবিতায় তুলে আনা চিহ্নায়কগুলি সহৃদয় পাঠকের 'মরমে' একটা অন্যতর বার্তা পৌঁছে দেয়— যে বার্তা পাঠককে শ্রুত স্বরের পাশাপাশি অশ্রুত স্বরকে হৃদয়ঙ্গমে সাহায্য করে। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে জনৈক সমালোচক যথার্থই লিখেছেন— "এই কবি পৃথিবীর সমস্তই স্পর্শ করেন অন্ধের মতো তীক্ষ্ণ কান, পশুর মতো ঘ্রাণশক্তি আর আঁধার ঘরে লতা গাছের মতো আলোকের জন্য উন্মুখতা নিয়ে..."

'বাঘ' কবিতায় দেখি—

"মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে

চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে—

আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা

আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।"

—এই গূঢ় বাচন আসলে পাঠকৃতির গভীরে ঢোকার সংকেত। গভীর গভীরতর ভালোবাসার চিহ্নায়ক হিসেবে 'বাঘ' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্রই পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী চিহ্নায়িত নৈঃশব্দ্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে। "আসলে সবকিছুর মূলে যখন চিহ্নায়কের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় তখন ভাষার অর্থও আমূল বদলে যায়। ভাষা সেতু গড়ে তোলে তবে এই সেতু দিয়ে তথ্যের বিনিময় হয় না কেবল সংকেতের চকিত উদ্ভাসন শ্রুত স্বরকে অশ্রুত স্বরের কাছাকাছিও এনে দেয়। পরাভাষার সমান্তরাল অপর অস্তিত্ব ভাষার মধ্যে নিরন্তর নবীন পরিসর আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে শাণিত করে তোলে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিহ্নায়কের সঙ্গে চিহ্নায়িতের সেতু গড়ে ওঠে।"

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে দেখি—

"আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা

আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।"

ভালোবাসা কতখানি নিবিড় হলে এই উচ্চারণ সম্ভব তা শব্দের সামর্থ্যে ফুটিয়ে তোলা বোধহয় অনেকটা দুঃসাধ্য। 'শুদ্ধসীমা থেকে' কবিতাটিতে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতাটির স্বরূপ সন্ধানে মগ্ন—

"শুদ্ধসীমা থেকে যাত্রা কবিতার সর্বাঙ্গে, যেমন

মধুর বিহ্বল পায়ে পিঁপড়ে পড়ে ছড়িয়ে সুধায়...

বিষে ও নির্বিষে, আমি যাই যেতে যেতে বাধা পাই

আনন্দে পশ্চিমে চলি, পূর্ব উৎকৃষ্ট ক্ষুধায়।"

'শুদ্ধসীমা থেকে' কবির যাত্রা 'কবিতার সর্বাঙ্গে'। তাই যাত্রার অনুষঙ্গে বিবৃত পাঠকৃতি থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে অজস্র চিহ্নায়কের দীপ্তি— যে দীপ্তি 'কবিতার অন্তর্গত কবিতা'কে প্রদীপ্ত করে তুলেছে গভীর আত্মমগ্নতায়। কবিতার পরতে পরতে 'মধুর বিহ্বল পায়ে' কবির যাত্রা যেন তাঁর শিল্পী সত্তারই অনাবিল প্রকাশ। আলোচ্য কবিতাটিতে 'উৎকৃষ্ট ক্ষুধা'-র তাগিদে যাবতীয় পারম্পর্য ভেঙে তছনছ করে কবিতার ভেতরে গিয়ে কবিতাকে দেখার যে একটা বিশেষ প্যাটার্নের (pattern) জন্ম দিলেন 'সমুৎপন্ন, সুস্থ' এই কবি তা এক কথায় অতুলনীয়। কবির কাছে জীবন সত্য আর কবিতায় সত্য সমার্থক হয়ে উঠেছে বলেই তাঁর এই হৃদয় নিঙড়ানো উচ্চারণ পাঠককে বিহ্বল করে—

"প্রসঙ্গত কোনো দিক, কোনো তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার মোহে

আমাকে যেতেই হবে, পূর্ণাপূর্ণ প্রাণে ও অপ্রাণে

ক্ষমতার কূট যদি শাস্তি দিত, হতাম অক্ষম

জড় ও জীবিত পিণ্ড, নৌকা ভাঙে ঘাটের সন্ধানে।"

তৃতীয় স্তবকের ভাষা পুরোপুরি চিহ্নায়ক খচিত, চিহ্নায়িত তাৎপর্য ও অসাধারণ ব্যঞ্জনাময়।

কবিতা যে জীবন-বহির্ভূত স্বতন্ত্র কিছু নয়, এক কথায় কবিতা সম্পর্কিত যাবতীয় চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা এবং মূল্যবোধকে বিনির্মিত চিহ্নায়কের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য কবিতায়।

কবিতাটির নিবিড়-পাঠ-শেষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যাবতীয় যৌক্তিক পারম্পর্য ভেঙে দেওয়া এক অনাবিষ্কৃত সত্যের অস্তিত্ব যা আমাদের আপাত সত্য দর্শনের মোহজাল ছিন্ন করে আমাদের চক্ষুষ্মান করে তোলে।

'কবিতার সত্যে' কবিতাটির শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক কবিতার মর্যাদা অর্জন করেছে।

'সে-তার প্রতিচ্ছবি' — স্বরবৃত্ত ছন্দে লিখিত কবিতাটিতে অপূর্ব এক নৃত্যচঞ্চল সুরের দোলা যেন আলোচ্য কবিতাটির অন্তর্নিহিত চিহ্নায়কগুলিকে অন্তর্দীপ্ত করে তুলেছে—

"একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো
সাদৃশ্য তার খুঁজলে আছে, হয়তো উঁচু গাছের কাছে
নয় পাহাড়ের সঙ্গে তুল্য খানিক অনুন্নত
একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো।...
একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো...
একটি শিকড়, স্থির যেন সে সেই শিকড়ের মতো।।"

তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত, প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে বিবৃত কবিতাটির কাব্যিক ব্যঞ্জনা এককথায় অসাধারণ। 'একটি চূড়া', 'একটি নদী' এবং 'একটি শিকড়' — এই তিনটি চিহ্নায়ক যেন জীবনের তিনটি দিক-নির্দেশক সংকেতের বার্তা বহন করেছে।

'আমাদের ঘর নাই— আছে তাঁবু অন্তরে বাহিরে' —এই সুদীর্ঘ কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

"সাইকেল সাইকেল — করে ছুটে আসে ক্ষেতফাটাহাওয়া
হল্‌দিবাড়ি রোড গেছে খরস্রোতা নদীর মতন
চাঁদের পিরিচ ভরে কালো জাম গিয়েছে ছড়িয়ে...
জানালার কাছে বসে মনে হয় পৃথিবীতে শুধু
এসেছি জাহাজে ভেসে যাবো বলে
কোনোদিকে নয়—...
জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে"

কবিতার ভাষা যে সংকেতের ভাষা উপরোক্ত পংক্তিগুলিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। প্রায় ষোলটি স্তবকে বিন্যস্ত কবিতাটিতে উপমা প্রয়োগের মুন্সিয়ানা কবির— অন্বিষ্ট বক্তব্যকে করে তুলেছে গভীর তাৎপর্যময়— 'সাইকেল, সাইকেল করে ছুটে আসে ক্ষেতফাটাহাওয়া', 'যেন মাকড়সার জাল— ঘিরেছে কুয়াশা চুলের ভিতরে মাখা রিবনের মতো' কিংবা 'সোনার কচ্ছপ কার পড়ে আছে দীর্ঘ নালি ঘাসে', 'সাঁতার অনেকে দেয় অতিদূর জ্যোৎস্নার ভিতরে'। আলোচ্য কবিতাটিতে ব্যবহৃত উপমাগুলি কবিতার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে একটা অন্যতর মাত্রায় উন্নীত করেছে।

"বসন্তের দেরি কতো? বৃষ্টি শেষ, আকাশ উজ্জ্বল
অকস্মাৎ মাঝরাতে ছেলেরাও মাঠে ফেলে বল...
ষ্টেশনে হঠাৎ দেখা— এদেশের বৃষ্টির মতন
বিদ্যুচ্চমকে
সারাসাত ছোট গাড়ি ব্রিজ ভেঙে, দমকে দমকে
আমাদের মন
এদেশের বৃষ্টিরই মতন"

যে সময় ও সমাজে আমরা বাস করছি সেখানে সবচেয়ে দ্রুত বদলায় মূল্যবোধ, ক্ষয় হয় অন্তঃসারের— 'হাত ঘুরালে' যেখানে খুব সহজেই 'নাড়ু' পাওয়া যায় এমনি সময়ে যাবতীয় চিন্তা-চেতনা ও জীবন-যাপনের প্রক্রিয়াকে কবি বিবর্তিত করলেন এভাবে—

“বারবার নষ্ট হয়ে যাই
প্রভু, তুমি আমাকে পবিত্র
করো, যাতে লোকে খাঁচাটাই
কেনে, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই
বারবার নষ্ট হয়ে যাই
একবার আমাকে পবিত্র
করো প্রভু, যদি বাঁচাটাই
মুখ্য, প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই।”

আলোচ্য কবিতাটিতে ‘প্রভু’ চিহ্নায়কটি গভীর সংকেতবাহী; ‘প্রভু’ শব্দটির একাধিক উচ্চারণের মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করার অদম্য তাগিদ। যাতে লোকে খাঁচাটাই কেনে, ‘প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই’ —এই আপাত-অসংলগ্ন পঙ্ক্তিগুলি আমাদের নিয়ে যায় সেই অনুভূতিলোকে যেখানে সময়ের গ্লানি বারবার কবিসত্তাকে গভীরভাবে আহত করে। সময়ের সুতীব্র দহনে দগ্ধ কবিসত্তা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না তার বিরুদ্ধ পরিবেশে, তাই নিরুপায় আত্মসমর্পণ— ‘যদি বাঁচাটাই মুখ্য, প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই’। স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই কী নষ্ট হয়ে যাওয়া! আলোচ্য কবিতায় কবি শক্তি অনুভবের এক ভিন্নতর মানে উপহার দিয়েছেন। ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’ কাব্যগ্রন্থের পাঠ-পরিক্রমা শেষে পাঠকের চোখে পড়ে চিহ্নময় প্রকরণের দিগন্ত বিস্তার।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’ — শক্তি চট্টোপাধ্যায়।
২. ‘শব্দ আর সত্য’ — শঙ্খ ঘোষ।
৩. ‘কবিতার রূপান্তর’ — শঙ্খ ঘোষ।
৪. ‘দেশ’ (১৯৯৫) শক্তিচট্টোপাধ্যায় সংখ্যা।

Citation: **চক্রবর্তী. ম.,** (2024) “শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’: চিহ্নময় প্রকরণের দিগন্ত বিস্তার”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-10, November-2024.